পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা

১লা চৈত্র, ১৩৮৪ বাংলা : ১৫ই মার্চ, ১৯৭৮ ইং : ৫ই রবিউস সানি, ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই মার্চ ১৯৭৮ ইং | ৩১শ বর্ষ ২১শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'নামাযের শর্তাবলী ও আদব'	অনুবাদ : এ. এইচ এম, আলী আনওয়ার	৮
০ অমৃতবাণী : 'স্বীয় সত্তার জোরালো ঘোষণা এবং জামাতকে জরুরী নছিহত'—	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১০
০ পবিত্র পয়গাম বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৫তম সালানা জলসা উপলক্ষে	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ আমীর বাঃ আঃ	১২
০ জুমার খোৎবা : 'সিনেমার অপকারিতা ও ধ্বংসাত্মক পরিণতি'	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : জনাব আহ্‌সান উল্লা সিকদার	১৭ ২১
০ বাহাই ফেৎনা	আলহাজ্ব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	
০ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা (২৪)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৩
০ বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত	শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	২৬
০ সংবাদ		২৮

দোওয়ার আবেদন

বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মোহ্‌তারম আমীর সাহেবা বেগম সাহেবা পক্ষকাল যাবৎ টাইফয়েডে পীড়িত আছেন। তাঁহার আশু রোগমুক্তির জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে। মোহ্‌তারম আমীর সাহেবই সালানা জলসার পরে তাঁহাকে দেখিতে আহ্‌মদ নগর গিয়াছেন।

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা

১লা চৈত্র, ১৩৮৪ বাং : ১৫ই মার্চ, ১৯৭৮ ইং : ১৫ই আমান, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিবাহ—এই বিষয়েও ইসলাম কতকগুলি নীতি নির্ধারণ করিয়াছে। যথা—স্ত্রীর দেন-মোহর স্থির করা এবং বিবাহ করিবার পূর্বে তাহাকে দেখা, যাহাতে পরবর্তীতে ফেতনা না হয়। বিবাহের সব কথা যখন উভয় পক্ষের মধ্যে স্থির হইয়া যায়, তখন মেয়েকে দেখিয়া লইলে বহু ভবিষ্যত ফেতনার মূলোৎপাটিত হইয়া যায়। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর যামানায় এক যুবক এক তরুণীর পাণি-প্রার্থী হয়। মেয়ের দিকের সকল বিষয় তাহার পছন্দ হইলে, সে মেয়েকে এক নযর দেখিতে চাহিল। তখন পরদার আদেশ নাযেল হইয়াছিল। পাত্রীর পিতা বলিল, "আমি ইহার অনুমতি দিতে পারি না। তখন সেই যুবক হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট গিয়া বলিল, "আমি অমুক মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহি। তাহার বিষয়ে আমার সব কথাই পছন্দ হইয়াছে কিন্তু আমি তাহাকে একবার দেখিতে চাই। এসম্বন্ধে আমি তাহার পিতার নিকট প্রস্তাব দিলে, তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "সে ভুল করিয়াছে। বিবাহের সব কথা যদি পাকা হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে মেয়েকে তুমি দেখিতে পার।" সেই যুবক মেয়ের পিতার নিকট গিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ শুনাইল। সে বলিল, "হযরত রসুল করীম (সাঃ) মেয়েকে দেখার অনুমতি দিয়া থাকিতে

পরেন, কিন্তু আমার আত্ম-মর্যাদা ইহা বরদাস্ত করিতে পারে না। তুমি বিবাহ কর বা না কর, আমি তোমাকে আমার মেয়েকে দেখার অনুমতি দিতে পারি না।" গৃহাভ্যন্তর হইতে মেয়ে এই আলাপ শুনিতেছিল। সে যখন তাহার পিতার শেষোক্ত জবাব শুনিল, তখন সে দরজার পরদা দুই হাত দিয়া সরাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "যখন হযরত রসুল করীম (সঃ) আমাকে দেখিবার জন্য আপনাকে অনুমতি দিয়াছেন, তখন আমার পিতা ইহাতে বাধা দিবার কে? আমি আপনার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছি। আপনি স্বচ্ছন্দে আমায় দেখিয়া লইতে পারেন।" মেয়ের রসুল-ভক্তির এই অভিব্যক্তিতে যুবক এরূপ অভিভূত হইয়া গেল যে সে দৃষ্টি নামাইয়া লইল এবং যুবতীর দিকে তাকাইল না। সে বলিল, "যে মেয়ের হৃদয়ে এতখানি রসুল প্রেম বিরাজমান যে, সে উহার মোকাবেলায় পিতার আদেশের প্রতি তাকায় না, তাহাকে আমি না দেখিয়াই বিবাহ করিতে চাহি।" তদনুযায়ী সে মেয়েকে না দেখিয়াই বিবাহ করিল। মোটকথা, ইসলাম পরদা প্রথার প্রবর্তন করিয় একদিকে যেমন মুসলমানগণকে মেয়েদের বে-পরদার বিপদাবলী হইতে বাঁচাইয়াছে, তেমনি না দেখিয়া মেয়েকে অন্ধভাবে বিবাহ করার পরবর্তী সম্ভাব্য ফেতনা সমূহ হইতেও তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। নাক নকশা রূপ রঙ সম্বন্ধে পরবর্তীতে যাহাতে কোন ফেতনা উঠিতে না পারে, তজ্জন্য ইসলাম নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছে যে, বিবাহের পূর্বে পাত্র পাত্রীকে দেখিয়া লইতে পারে।

অতঃপর আসে **হুকুমতের হক**ঃ কুরআন করীম সে সম্বন্ধেও শিক্ষা দিয়াছে। শাসকের কি কি অধিকার এবং তাহার আদেশের সীমা কতখানি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে আদেশ দিতে পারে না, ইত্যাদি বিষয় ইসলাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী হুকুমত নির্বাচন পদ্ধতিতে হওয়া কর্তব্য। দুনিয়ার অপর কোন ধর্ম নির্বাচনের পদ্ধতিতে হুকুমত কায়েম করার ব্যবস্থা দেয় নাই। ইসলাম শাসককে আদেশ দিয়াছে যে, সে যেন জনসাধারণের মতের মর্যাদা করে। অবশ্য তাহাদের প্রকাশিত মতের দ্বারা যদি ধর্ম বা দেশের স্বার্থে আঘাত লাগে, তাহা হইলে সে উহার বিরুদ্ধে ফয়সালা দিতে পারে। কোন কোন শাসক বলে, "আমি যখন সাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছি, তখন পুনরায় তাহাদিগের মত লইবার কোন প্রয়োজন নাই। ইসলাম ইহার বৈধতা স্বীকার করে না। ইসলাম বলে, এক কমিটি বানাইতে হইবে, যাহা তাহাকে জরুরী বিষয়ে পরামর্শ দিবে। সাধারণভাবে কমিটির সংখ্যাধিক্যের রায় সে মানিতে বাধ্য থাকিবে। একমাত্র সেই ক্ষেত্রে, যেখানে সে

কোন পরামর্শকে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থি বিবেচনা করিবে। একমাত্র সেই ক্ষেত্রে সে প্রদত্ত পরামর্শের বিরুদ্ধে ফয়সালা গ্রহণ করিতে পারিবে। ইহা পরিষ্কার কথা যে শাসন-দণ্ড পরিচালক জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হইলে, সে অযথা জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে চলিবে না সে কেবল তখনই সংখ্যাধিক্যের মতকে বাতিল করিবে, যখন সে কোন প্রস্তাবকে জাতি ও দেশের স্বার্থের খেলাপ বলিয়া বুঝিবে এবং এইরূপ পদক্ষেপ সেই ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারিবে যে পরম বিশ্বস্ত এবং খোদার নৈকট্য প্রাপ্ত। মোট কথা, ইসলাম পরামর্শ গ্রহণের গুরুত্বকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, وشاورهم فى الامر (আলে-এমরান : ১৭) অর্থাৎ "তুমি জরুরী বিষয়ে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ কর।" এই নিয়ম অপর কোন মযহবে পাওয়া যায় না। গণতন্ত্রবাদীগণ যে ডেমোক্রেসীর দাবীদার, সেই ডেমোক্রেসীকে প্রকৃত অর্থে ইসলামই কায়েম করিয়াছে এবং এ ব্যাপারে কোন মযহাব ইসলামের সহিত মোকাবেলা করিতে পারিবে না।

দুশমনদের সম্বন্ধে ইসলাম কি শিক্ষা দেয়, এখন আমি সেই বিষয়ের আলোচনা করিব দুনিয়াবাসীর হেদায়েতের জন্য আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে যখনই নবীগণ আসিয়াছেন, তখন কতক লোক তাঁহাদিগের উপর ঈমান আনিয়া তাহাদের বন্ধু হইয়া গিয়াছেন এবং কতক লোক তাঁহাদের দুশমণ হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে বন্ধুত্ব ও দুশমনীর সেলসেলা কেবল নবীগণের জামাতের সম্পর্কে সীমাবদ্ধ নহে। রাজ্য সমূহের প্রতি নযর ফিরাইলেও আমরা দেখিতে পাই যে, কোন রাজ্যের সহিত কতকগুলি রাজ্য বন্ধুত্ব পাতিলে অপর কতকগুলি জাতি উহার দুশমণ হইয়া যায়। কিন্তু এরূপ কোন মযহব পাওয়া যাইবে না যাহা বন্ধু এবং শত্রু উভয়ের হক বর্ণনা করিয়াছে। একমাত্র ইসলাম ধর্ম যেরূপ বন্ধুগণের প্রতি ব্যবহারের নিয়ম বর্ণনা করিয়াছে, সেইরূপ শত্রু-গণের প্রতিও ব্যবহার প্রণালী বর্ণনা করিয়াছে। তওরাত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তুমি দুশমণদের গৃহে প্রবেশ কর, তখন বাটিস্থ সকল পুরুষকে হত্যা করিয়া ফেল এবং স্ত্রীলোক এবং বাচ্চাগণকে বন্দী কর। এবং কোন কোন অবস্থায় এমন আদেশও দেওয়া হইয়াছে যে, দুশমণের জানোয়ারগুলিকেও হত্যা করিয়া ফেল। এই আদেশের মধ্যে কঠোরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু ইসলাম যে শিক্ষা দিয়াছে, উহা ন্যায়-নীতি ভিত্তিক ও অতি উচ্চাঙ্গের। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যুদ্ধ সম্বন্ধে দেখা যায় আল্লাহতায়ালা কুরআন করীমে বলিয়াছেন, وقاتلوا الذين يقاتلونكم (সুরা বাকরাহ-২২ রুকু) অর্থাৎ তুমি ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ কর, যাহারা তোমার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে নাই,

তাহার বিরুদ্ধে লড়িবার ও তরবারী ধারণ করিবার তোমার কোন অধিকার নাই। ইসলাম যাহাদিগকে দুশমনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অধিকার দিয়াছে, তাহাদিগকে আবার এ অধিকার দেয় নাই যে, তাহারা স্ত্রীলোকগণকে আক্রমণ করে। এমন কি যে স্ত্রীলোকগণ যুদ্ধে শামিল আছে, তাহাদিগকেও একান্ত চরম অবস্থা না ঘটিলে, ইসলাম আক্রমণ করিতে অনুমতি দেয় না। ইতিহাসে বর্ণিত আছে. এক যুদ্ধ উপলক্ষে এক সাহাবী দেখিলেন যে, কাফেরগণের সৈন্যদলে এক ব্যক্তি সৈন্যগণকে যুদ্ধে উত্তেজনা যোগাইতেছিল এবং মুসলমানগণকে হত্যা করার জন্য প্ররোচনা দিতেছিল। তিনি তখন ঐ ব্যক্তির দিকে আগে বাড়িয়া গেলেন এবং আক্রমণ উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সে পুরুষবেশধারী স্ত্রীলোক। তিনি তক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলেন। তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে বলিলেন, আপনি এ কি করিলেন? আপনি ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি উহার নিকটে গিয়া দেখিলাম যে, সে স্ত্রীলোক. পুরুষের বেশ পড়িয়া আছে। আমি সমীচীন মনে করিলাম না যে, আমি এক স্ত্রীলোককে আক্রমণ করি।' (সীরাতে হলবীয়া, জিলদ ২নং, উহোদের গযওয়া) অথচ সেই স্ত্রীলোক ইতিপূর্বেই তাহার প্রচরণার দ্বারা কতক মুসলমান সৈন্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছিল। কিন্তু সেই সাহাবী তাহাকে কিছুমাত্র বলিলেন না, কারণ হযরত রসুল করিম (সাঃ) স্ত্রীলোকগণের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে হাদীসে এক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার হযরত রসুল করীম (সাঃ) যুদ্ধের ময়দান পরিদর্শন করিতে ছিলেন। তিনি একটি স্ত্রীলোকের লাশ দেখিলেন। সাহাবা (রাঃ আঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটির লাশ দেখিয়া তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল এবং তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি এ কাজ করিয়াছে সে গর্হিত কাজ করিয়াছে। ভবিষ্যতে যেন কেহ এইরূপ কাজ না করে। (বুখারী জেহাদ পর্ব,)

নবী করীম (সাঃ) যখন দুশমনের মোকাবেলার জন্য কোন লশ্‌কর পাঠাইতেন তখন তিনি তাহাদিগকে হেদায়ত দিতেন যে, আল্লাহতায়ালার পথে যুদ্ধ কর। অবিশ্বাসের কাজ করিও না, কোন নাবালককে হত্যা করিও না, স্ত্রীলোকগণকে হত্যা করিওনা. উপাসনালয়ে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণকে হত্যা করিওনা, কোন দুর্বল বৃদ্ধাকে হত্যা করিওনা, কোন ছোট বাচ্চাকে বা স্ত্রীলোককে হত্যা করিও না।" (আবু দাউদ)। মোট কথা, ইসলাম দুশমনেরও হকসমূহ কায়েম করিয়াছে এবং উহার সহিত ন্যায়বিচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছে। আমার জ্ঞানে এই প্রকার কোমল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত কোন মযহবে পাওয়া

যাইবে না। বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন জারী হইয়াছে। ইহার দ্বারা অনেকগুলি নীতি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যখন এই সকল রাজনৈতিক আইন প্রণয়ন হয় নাই, এবং কেহই এই সকল জানিত না, সেই সময়ে এই সকল কল্যাণপূর্ণ হেদায়েত দ্বারা কে জগতকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল এবং কে জগতকে বর্বরতা ও ক্রুরতা হইতে উদ্ধার করিয়া মানবতা ও দয়ার্দ্রচিত্ততার শিক্ষা দিয়াছিল ? হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখনই জেহাদের জন্য বাহির হইতেন, তখনই আক্রমণের পূর্বে দাঁড়াইয়া যাইতেন, যাহাতে দুশমন তাহার আগমন সম্বন্ধে অবহিত হইয়া যায় এবং এমন না হয় যে দুশমন অজ্ঞতায় থাকিয়া যায় এবং আক্রমণ অতর্কিত হয়। তদনুযায়ী তিনি সদা রাত্রি প্রভাত হইলে আক্রমণ করিতেন এবং বিপক্ষের দিক হইতে আযানের শব্দ আসিলে তিনি আক্রমণ করিতেন না। বিপক্ষের দিক হইতে আযানের শব্দ না আসিলে, প্রভাত হইয়া গেলে পরে তিনি বিপক্ষকে আক্রমণ করিতেন। ইহা এই জন্য যে কোন বন্ধু যেন অজানিতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। আজকাল লোক অতর্কিত ঘুমন্ত জনগণকে রাত্রি-কালে অতর্কিতে আক্রমণ করে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) কখনও ইহা করিতেন না। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানগণও দুশমনের উপর রাত্রিবেলায় আক্রমণ চালাইয়াছে, কিন্তু এ ব্যাপারে তাহারা কখনও অগ্রাক্রমণ করে নাই। তাহারা আগে আক্রান্ত হইলে পর, প্রতি-আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। মোট কথা, এ কাজে প্রথম পদক্ষেপ মুসলমানগণের পক্ষ হইতে কখনও লওয়া হয় নাই। কারণ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হেদায়ত ছিল যে, রাত্রিকালে এবং অতর্কিতে কখনও আক্রমণ করিবে না। স্ত্রীলোক, বাচ্চা, বৃদ্ধ, ধর্মযাযক, সংসারত্যাগী ব্যক্তি এবং ঘরে অবস্থিত ব্যক্তিকে হত্যা করিবে না। যাহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, কেবল তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে।

ইসলাম যুদ্ধ সম্বন্ধে এই নীতি নির্ধারিত করিয়াছে যে, যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া কখনও কোন জাতির সহিত লড়াই করা সঙ্গত নহে। এখন আন্তর্জাতিক আইনও দাবী করে যে যুদ্ধের পূর্বে উহার ঘোষণা জরুরী। কিন্তু সর্ব প্রথম ইসলামই এই নীতি নির্ধারিত করে যে, তোমার প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত যদি চুক্তি থাকে, তাহা হইলে, فانبذ اليهم على سواء (সুরা আনফাল—৭০ রুকু) অর্থাৎ "প্রথমে ঘোষণা কর যে, বর্তমান পরিস্থিতে তোমার সহিত আমার চুক্তি বজায় থাকিতে পারে না।" এতদ্বারা বিপক্ষ সংশোধনের সুযোগ পাইবে এবং সংশোধন না করিলে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে।

ইসলামের আরও এক শিক্ষা এই যে, দুশমন অস্ত্রসংবরণ করিয়া লইলে, তোমারাও অস্ত্র সংবরণ কর। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, وان جنحوا للسلم فاجنح لها (সুরা আনফাল—৮ রুকু) অর্থাৎ "যদি কোন জাতি তোমাদের সহিত সন্ধি করিতে চাহে, তাহা হইলে অস্বীকার করিও না। সন্ধির ঘোষণার পর যুদ্ধ বিধি সঙ্গত নহে।"

অনুরূপভাবে বিভিন্ন রাজ্যের সহিত সম্বন্ধের ব্যাপারেও ইসলাম এরূপ আইন নির্ধারণ করিয়াছে যে, অপর কোন জাতি ইহার মোকাবেলা করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন রাজ্য সমূহের মধ্যে পরস্পর বিভেদ দূর করিবার জন্য কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করিয়াছে, সেগুলি এরূপ পূর্ণ ও অকাট্য যে, পূর্বকার লীগ অফ নেশান স বা উহার স্থলাভিষিক্ত বর্তমান জাতিসঙ্ঘ ও ঐ নীতিগুলির মোকাবেলা করিতে পারে। কারণ কুরআন করীম নির্ধারিত নীতিমালা না পূর্ববর্তী বা পরবর্তী জাতি-সংঘ পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই। [ইহার বিস্তারিত বিবরণ হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) প্রণীত আহমদয়াত পুস্তকে দ্রষ্টব্য]। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন—

ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احدا هما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين (হুজরাত ১ম রুকু)

অর্থাৎ "যদি দুই জাতি যুদ্ধে নামিয়া যায়, তাহা হইলে বাকী রাজ্যগুলির কর্তব্য হইবে, তাহাদের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা। যদি কোন পক্ষ ফয়সালা মানিতে অস্বীকার করে এবং অন্যপক্ষের উপর হামলা করে, তাহা হইলে সকল জাতির কর্তব্য হইবে, তাহারা যেন সকলে মিলিত হইয়া এক যোগে অবাধ্য পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং ততক্ষণ তাহার বিরুদ্ধে সকলে যুদ্ধ চালাইয়া যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই অবাধ্য জাতি মাথা নত করিয়া সকল জাতি প্রদত্ত ফয়সালা মানিয়া লয়। অতঃপর যদি অবাধ্য পক্ষ অন্যায় স্বীকার করিয়া ফয়সালা মানিতে রাজী হয়, তাহা হইলে, জাতি সংঘের কর্তব্য হইবে প্রথম ফয়সালা কার্যকরী করা। অন্যান্য জাতির মধ্যে কেহ সুযোগ গ্রহণ করিয়া অবৈধ ফায়দা হাসিলের বা অবাধ্য জাতিকে লুটিবার চেষ্টা না করে। মূল বিবাদের অবসান ঘটাইবার মধ্যে ফয়সালাকে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। দুনিয়ায় শান্তি কায়েম রাখার জন্য এই বিধানই যথেষ্ট।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) যখন ১৯২৪ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড যান, তখন লীগ অফ নেশানস কায়েম হইয়াছিল। তখনই তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, লীগ অফ নেশানস যে নীতি অনুসরণ করিতেছে, উহার ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান সফলকাম হইবে না। কারণ কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে, দুই বিবাদমান জাতির মধ্যে অবাধ্য পক্ষকে ফয়সালা জানাইবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে যেন দুনিয়ার সকল জাতি এক যোগে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু লীগ অব নেশানসের আইন-কানুনের মধ্যে ইহার ব্যবস্থা ছিল না। অতঃপর যখন আবার লীগ অব নেশানস ভাঙ্গিয়া ইউ এনে-স্থাপিত হয়, তখনও তিনি একই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেন। কুরআন করীমের নীতি পালন করায় জাতিসংঘ জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি রক্ষার ব্যাপারে উত্তরোত্তর ব্যর্থতার পরিচয় দিতেছে। বর্তমানে যদিও অবাধ্য জাতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিয়ম জাতিসংঘের বিধানে রহিয়াছে, তথাপি কয়েকটি বিপরীত স্বার্থমুখী বৃহৎ শক্তির হস্তে ফয়সালার চাবি-কাঠি থাকায়, সেখানে কোন বিবাদের ফয়সালা হয় না। ফলে অমীমাংসিত বিবাদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িয়া পুঞ্জীভূত হইয়া, মহা অগ্নিগিরির সৃষ্টি হইতেছে, যাহার ইন্ধনে বৃহৎ শক্তিগুলির মরণ শয্যা অবশ্যম্ভাবি। আজও জগত বাঁচিয়া যাইতে পারে, যদি কুআন করীমের ব্যবস্থা জাতিসংঘ পূর্ণভাবে গ্রহণ ও কার্যকরী করে। এরূপ হইলে দুনিয়ায় আবার শান্তি ফিরিয়া আসিবে এবং মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবে।

উপরে আমরা যে আলোচনা করিলাম উহার মধ্যে মানব জাতির কল্যাণ সম্বন্ধে ইসলাম যে সকল শিক্ষা দান করিয়াছে, তাহার বর্ণনা করা হইল। ইহার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোন মযহব পেশ করিতে পারিবে না। (ক্রমশঃ)

✱ "ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে পার্থিব দুঃখ কষ্ট দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে যে ভাবে পূর্বে মোমেনদেরকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং সাবধান থাকিও, কেননা এমন যেন না হয় যে তোমরা হোঁচট খাও। পৃথিবী তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, যদি আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থাকে।" কিশতিয়ে নূহ—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

✱ "তোমরা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মারফত যে ঐশী ঐশ্বর্যান লাভ করিয়াছ, উহা খেলাফতের মাধ্যমে চিরকাল কায়েম রাখ।" —হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)

হাদিস শরীফ

২৭। নামায—শর্তাবলী ও আদব।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৬২। হযরত মায়ায রাজি আল্লাহু আনহু বলেন যে একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার হাত ধরিয়া বলেন :

"খোদার কসম, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে তাকিদ করিতেছি যে, কোন নামাযের পর যেন এই জিকির বাদ না যায় : "আল্লাহুমা, আয়েন্নি আলা যিকরেকা ওয়া শুকরেকা ওয়া হুসনে ইবাদাতেকা"—আল্লাহ আমার আমাকে সাহায্য কর তোমাকে স্মরণ করিতে, তোমার শোকর করিতে এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করিতে।"

(আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, ১ : ১৩ পৃঃ)

১৬৩। হযরত আবু হুরায়রাহ বলেন :—একদা কতিপয় দরিদ্র মোহাজেরের আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া নিবেদন করিলেন, "মালদার অনেক সাওয়াব নিয়া গিয়াছেন এবং স্থায়ী নে'মাতের অধিকারী হইয়াছেন" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন, এ কেমন কথা? তাঁহারা আরও বলিলেন, "তাঁহারা তেমনি নামায পড়েন যেমন আমরা পড়ি, তেমনি রোযা রাখেন যেমন আমরা রাখি, কিন্তু এর সাথে তাঁহারা খোদার পথে খরচ করেন এবং আমরা পারিনা তাঁহারা আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যুদ্ধবন্দী আযাদ করেন এবং আমরা পারি না।" ইহাতে হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন, "আমি কি তোমাদিগকে এমন কথা শিখাইব না, যাহার ফলে তোমরা তাহাদের সমান হও এবং তাহাদের আগে চলিয়া যাও, যাহারা পরে আসিবে? অর্থাৎ ইহার কল্যাণ ও বরকতে কেহ যেন তোমাদিগকে ডিঙ্গাইয়া না যায় ইহা ছাড়া যে, তাহারাও তোমাদেরই মত তাহাই করিতে আরম্ভ করে" ঐ মুজাহেরগণ নিবেদন করিলেন, হে রসুলুল্লাহ, এমন কথা জরুর আমাদিগকে বলুন। তিনি (সাঃ) বলিলেন, "প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার করিয়া সুবাহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবর' পাঠ করিবে। ঐ সাহাবাগণ সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পর এই দরিদ্র মুহাজেরগণই আবার তাঁহার খেদমতে হাজির হইলেন এবং এই অভিযোগ করিলেন : "আমাদের ধনী ভ্রাতারাও জানিতে পারিয়া এই আবৃত্তি (জিকর) আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন : "এই যে আল্লাহর ফযল' তাঁহার অনুগ্রহ। যাহাকে চান, দেন। আমি এই অনুগ্রহ কিরূপে রোধ করিতে পারি?"

(মুসলিম, কিতাবুস্‌সালাত)

১৬৪। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৩বার "আল্লাহু আকবর" বলে এবং এক শত পূরা করার জন্য এই 'জিকির' করে যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য, আরাধ্য, প্রিয় নাই, তিনিই এক তাঁহার কোন শরীক নাই, তিনিই বাদশাহ প্রশংসা ও স্তুতির যোগ্য, তিনি সর্বশক্তিমান", তাহার সব গোনাহ ক্ষমা হইবে, সমুদ্রের ফেনার সমানই হউক না কেন? অর্থাৎ অনেক অধিক হইলেও।"

(মুসলিম, কেতাবুস্‌সালাত, ১: ১ ২২৩ পৃ:)

১৬৫। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন: "আ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লম আমার গৃহ যোহরের পূর্বে চারি রাকায়াত নফল পড়িতেন। তারপর লোকদের নামায পড়াইবার জন্য মসজিদে যাইতেন। তারপর আসিয়া দুই রাকাত পড়িতেন। সেইরূপ তিনি (স:: যখন মাগরিব এবং এশার নামায পড়ানোর পর গৃহে আসিতেন, তখন দুই রাকাত নামায পড়িতেন।" ('মুসলিম', কেতাবুস সালাত, ১: ১৮০)

১৬৬। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যোহরের পূর্বে চারি রাকাত এবং সকালের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত কখনও ছাড়িতেন না।" ('বুখারী', 'কতাবুস সালাত', ১: ১৫৭ পৃ:)

১৬৭। হযরত হাফসাহ্ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, মুয়াযযিন ভোরে আযান দিলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুই রাকাত সুন্নত পড়া আরম্ভ করিতেন এবং হাল্কা ভাবে পড়িতেন। মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে, প্রভাত হওয়ার পরে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুই রাকাত সুন্নত ব্যতীত অন্য কোন সুন্নত বা নফল পড়িতেন না।

('মুসলিম', 'কেতাবুস সালাত, বাবু ইস্তেজাবু রাকাতায় সুন্নাতিল ফাজরে, ১: ১৮৭ পৃ:)

১৬৮। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শেষ রাত্রিতে ১১ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়িতেন। ফজর হইলে দুই রাকাত হাল্কা ভাবে পড়িতেন। যখন মুয়াযযিন নামাযের জন্য খবর করিত, তখন তিনি নামায পড়ানর জন্য যাইতেন।" ('বুখারী', কেতাবুত দাওয়াত, ২: ৯৩৩ পৃ:)

১৬৯। হযরত ইবনে উমর রাযি আল্লাহু তায়ালা আনহুমা বলেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়া সাল্লাম রাত্রির নফল নামায দুই রাকাত করিয়া পড়িতেন এবং শেষে এক রাকাত পড়িয়া উহাকে বেতের ('অযুগ্ম') করিতেন। ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকায়াত পড়িতেন এবং এত হাল্কা পড়িতেন যেন ইকামত শুরু হইয়াছে। ('মুস্‌লিম, কেতাবুল সালাত, ১: ২৫০ পৃ:)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

— এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

স্বীয় দাবীর সত্যতার জোরালো ঘোষণা এবং আপন জামাতের প্রতি জরুরী নসিহত

"ইহা আল্লাহতায়ালার স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ, যাহার রক্ষণাবেক্ষণ স্বয়ং ফেরেস্তাগণ করেন "

ইহার বিরুদ্ধে মানবীয় কলা-কৌশল ও পরিকল্পনা সমূহ সত্বেও ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া এবং ক্রমাগত উন্নতি লাভ করাই ইহার খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম প্রমাণ "

'হে নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিগণ! জাগ্রত হও; হে গাফিল ও উদাসীন ব্যক্তিগণ! উঠিয় দাঁড়াও, এক মহান বিপ্লবকাল সমাগত। ইহা ক্রন্দন করিবার সময়, নিদ্রা গমনের নহে। ইহা আর্তনাদের সময়, হাসি-বিদ্রূপের নহে।..... দোওয়া কর, যেন খোদাতায়ালা তোমাদিগকে দৃষ্টি দান করেন, যাহাতে তোমরা বর্তমান যুগের আঁধারকেও সম্যক প্রত্যক্ষ করিতে পার এবং সেই জ্যোতিকেও, যাহা ইলাহী রহমত বা ঐশীকৃপা এই আঁধারকে তিরোহিত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। শেষ রাত্রিতে উঠ এবং খোদাতায়ালার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া হেদায়েত প্রার্থনা কর। অন্যায়রূপে এই সত্য ও হক্কানী সেলসেলাকে ধ্বংস করার নিমিত্ত বদ-দোওয়া পরিত্যাগ কর এবং দুরভিসন্ধি আঁটিও না।

খোদাতায়ালা তোমাদের ঔদাসীন্য এবং ভ্রান্তিমূলক ইচ্ছা-কামনার অনুসরণ করেন না। তিনি তোমাদের মন ও মস্তিষ্কের রোকমী সমূহ তোমাদের উপর প্রকাশ করিয়া দিবেন। তিনি আপন বান্দার সহায়ক ও সমর্থনকারী হইবেন এবং সেই বৃক্ষকে কখনও কর্তন করিবেন না, যাহা তিনি নিজ হস্তে রোপন করিয়াছেন তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার নিজ হাতে রোপিত সেই চারা-গাছকে কখনও কর্তন করিতে পারে, যাহার ফলদানের সে আশা রাখে? সুতরাং সেই প্রেমময়, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বাপেক্ষা দয়াময় 'আরহামুর রাহেমীন' খোদা তাঁহার সেই চারা-গাছকে কেন কর্তন করিবেন, যে চারা-গাছের ফল দানের মুবারক দিনগুলির তিনি প্রতিক্ষা করিতেছেন। যখন তোমরা মানুষ হইয়া যে কাজ করিতে চাহ না, তখন যিনি আলেমুল গাইব'—সকল অজ্ঞেয় বিষয় পরিজ্ঞাত, যাঁহার দৃষ্টি প্রত্যেক মানব হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত প্রসারিত, তিনি কেন তাহা করিবেন?"

(আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ৫৪, ৫৫)

"মিথ্যাবাদী কি কখনও সফলকাম হইতে পারে ? ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ('নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে কখনও সফলতার পথ দেখান না'—অবুবাদক)। মিথ্যাবাদীর ধ্বংস ও নিপাতের জন্য তাহার মিথ্যাই যথেষ্ট। যে কার্য খোদাতায়ালার জালাল ও প্রতাপ এবং তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর বরকাত ও কল্যাণরাজী প্রকাশ ও প্রমাণের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে এবং যে বৃক্ষ স্বয়ং খোদাতায়ালার হস্তে রোপিত হয়, উহার হেফাজত স্বয়ং ফেরেস্তাগণ করেন। এমন কে আছে যে, উহাকে বিনষ্ট করিতে পারে ?

স্মরণ রাখিও, যদি আমার কায়েমকৃত সেলসেলা নিছক দোকানদারী হয়, তাহা হইলে উহার নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে কিন্তু যদি ইহা খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং নিশ্চয় ইহা তাঁহারই পক্ষ হইতে কায়েমকৃত, তাহা হইলে সমগ্র জগৎও যদি ইহার বিরুদ্ধচারণ করে, তথাপি ইহা বর্দ্ধিত হইবে, প্রসার লাভ করিবে এবং ফেরেশতাগণ ইহার হেফাজত করিবেন। একটিও ব্যক্তি যদি আমার সঙ্গে না থাকে এবং কেহও যদি আমাকে সাহায্য না করে, তথাপি আমি দৃঢ় প্রত্যয় রাখি যে, এই সেলসেলা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

বিরোধিতার আমি কোনই পরোয়া করি না। আমি ইহাকে ও আমার উন্নতির জন্য অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করি। এমন কখনও হয় নাই যে, খোদাতায়ালার কোন মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট এবং খলিফা জগতে আসিয়াছেন, অথচ মানুষ তাহাতে নিরবে গ্রহণ করিয়াছে।" (আল হাকাম, ১৭ই জুলাই, ১৯০৫—মলফুযাত, ৭ম খণ্ড পৃঃ ১৪৮)

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, এই সেলসেলা খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে কায়েম হইয়াছে। যদি ইহা মানবীয় হস্ত ও পরিকল্পনার প্রতিফলন হইত, তাহা হইলে মানবীয় কলা কৌশল ও প্রচেষ্টা এবং মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ পর্যন্ত ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিত। যাবতীয় মানবীয় পরিকল্পনার মুকাবেলায় ইহা বর্দ্ধিত হওয়া এবং ক্রমাগত ইহার উন্নতি লাভ করাই ইহার খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম প্রমাণ। সুতরাং তোমরা নিজেদের একীন ও বিশ্বাসের শক্তি যত বৃদ্ধি করিবে, ততই তোমাদের হৃদয় উজ্জ্বল ও উদ্দীপিত হইবে।

কুরআন শরীফ অধ্যয়ন কর এবং খোদাতায়ালা সম্পর্কে কখনও নিরাশ হইবেনা। মুমেন কখনও খোদাতায়ালা হইতে নিরাশ হয় না। তাঁহার সম্পর্কে নিরাশ হওয়া অবিশ্বাসীদের স্বভাবের অন্তর্গত। আমাদের খোদা 'আলা কুলে শাইয়িন কাদীর' —সর্বশক্তিমান খোদা। (আল-হাকাম, ২৪ শে জুন ১৯০২ইং—মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ২৫৭-২৫৮)

"আমি এখন আমার জামাতকে, যাহারা আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহরূপে গ্রহণ করিয়াছে, বিশেষভাবে নছিহত করিতেছি যে, দুষ্কৃতি ও অহিতসাধন হইতে বিরত থাকিবে, এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে। নিজেদের অন্তরকে তোমরা বিদ্বেষ ও ঈর্শা হইতে মুক্ত ও পবিত্র কর। এরূপ স্বভাবের দ্বারা তোমরা ফেরেশ্‌তাগণের ন্যায় হইয়া যাইবে। কত পঙ্কিল ও অপবিত্র সেই ধর্ম যে ধর্মে মানুষের প্রতি সহানুভূতি নাই। এবং কত অপবিত্র সেই পন্থা বা মতবাদ, যাহা প্রবৃত্তি ও বাসনা-কামনা গত ঘৃণা ও বিদ্বেষের কণ্টকে পরিপূর্ণ। সুতরাং তোমরা, যাহারা আমার সঙ্গে আছ, তদ্রূপ হইও না। চিন্তা করিয়া দেখ, ধর্মের উদ্দেশ্য ও অবদান কি? তাহা কি এই যে, সর্বদা মানব নির্যাতনে লিপ্ত থাকা তোমাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট ও জীবন-ধারায় পরিণত হউক? কখনও নয়, বরং ধর্মের উদ্দেশ্য হইল সেই জীবনকে লাভ করা, যাহা খোদাতায়ালার মধ্যে বিদ্যমান এবং সেই পবিত্র জীবন না কেহ লাভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও কেহ লাভ করিতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদায়ী সিফাত বা ঐশী গুনাবলী মানুষের আভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করে। খোদার জন্য সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, যাহাতে আকাশ হইতে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়। ....তোমরা সর্ব প্রকার হীন পার্থিব ঘৃণা ও বিদ্বেষকে পরিত্যাগ কর এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও এবং খোদাতায়ালার মধ্যে বিলীন হইয়া যাও। তাঁহারই সহিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বচ্ছ ও পবিত্র সম্পর্ক কায়েম কর। কেননা ইহাই সেই পন্থা, যদ্দ্বারা কেরামত (অলৌকিক ক্রিয়া) সমূহ সাধিত হয় ও দোওয়াসমূহ কবুল হয় এবং ফেরেশ্‌তাগণ সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হন কিন্তু ইহা একদিনের কাজ নয়। উন্নতি কর। অধিকতর উন্নতি কর।

(গভর্মেন্ট ইংরেজী আওর জেহাদ, পৃঃ ১৩)

"আমাদের নীতি এই যে, সমগ্র মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন হিন্দু প্রতিবেশীকে দেখিতে পায় যে, তাহার গৃহে আগুন ধরিয়াছে কিন্তু তদসত্বেও সেই আগুন নিভাইবার জন্য সে সাহায্যার্থে আগাইয়া যায় না; তাহা হইলে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি আমার শিষ্যদের মধ্যে কেহ দেখিতে পায় যে কোন খৃষ্টানকে কেহ হত্যা করিতেছে, কিন্তু এতদসত্বেও সে তাহাকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্য করে না, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে সঠিক বলিতেছি যে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ... .আমি হলপ করিয়া বলিতেছি এবং যথার্থ বলিতেছি যে, কোন জাতির প্রতি আমার শত্রুতা নাই অবশ্য যথাসম্ভব তাহাদের আকায়েদ ও ভাব-ধারণার ইসলাহ্ ও সংশোধন করাই আমার কাম্য যদি কেহ গাল-মন্দ দেয়, তবে আমাদের অভিযোগ শুধু খোদাতায়ালার দরবারেই থাকিবে, অন্য কোন আদালতে নহে। এবং এতদসত্বেও মানবজাতির সহানুভূতি আমাদের হক ও অপরিহার্য কর্তব্য।"
(সিরাজে মুনীর, পৃঃ ২৮)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ,

نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

بسم الله الرحمن الرحيم

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

هو الناصر

বাংলাদেশবাসী ভাই সকল !

আস্ সালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহে ও বারাকাতুহু !

আমাকে জানানো হইয়াছে যে, এ বৎসর আপনাদের সালানা সমাবেশ ৩রা, ৪ঠা এবং ৫ই মার্চ অনুষ্ঠিত হইবে। জামাতের এই প্রকারের সমাবেশ পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বাড়াইবার এবং জামাতের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করার উপলক্ষ হইয়া থাকে। আমি আশা করি সকল নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে এই উপলক্ষ হইতে পুরাপুরি ফায়দা হাসেল করিবেন এবং এক দৃঢ় সংকল্প, নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহ নিজেদের কাজকে জারি রাখিবেন এবং নিজেদের জিম্মাদারীকে পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতা সহকারে আঞ্জাম দানে সচেষ্ট থাকিবেন।

এতদুপলক্ষে আমি আপনাদিগের দৃষ্টি দুই তিনটি বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে চাই :

প্রথম কথা—

চতুর্দ্দশ শতাব্দী হিজরী শেষ হইতে চলিয়াছে। সুতরাং স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, নূতন শতাব্দীর শিরোভাগে কি নূতন মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হইবেন। এ সম্পর্কে ইহা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, যদিও আল্লাহ্তায়ালা কুরআন করীমের আকারে শরীয়তকে কামেল করিয়া দিয়াছেন এবং দুনিয়ার শেষ এবং পূর্ণ শরীয়ত হিসাবে ইহার যমানা কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির সকল প্রকার সম্ভাব্য সমস্যার সমাধানের জন্য যে হেদায়েতের প্রয়োজন ছিল, সে সকলই উহার মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু যামানার আবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন হইতে থাকে এবং পরিবর্তিত অবস্থার সমাধান যদি সময়ের পূর্বে বলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে, সেই জন্য কুরআন করীমের তত্ত্বজ্ঞান এবং যুগ-সমস্যাবলীর সমাধান খোদাতায়ালার এরূপ পবিত্র বান্দাগণের

উপর প্রকাশিত হইতে থাকে, যাঁহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুগমনে বিলীন হইয়া আল্লাহ্-তায়ালার নৈকট্যের উচ্চ মোকাম লাভ করিয়া থাকেন। বর্তমানে আমরা যে যামানার মধ্য দিয়া পার হইতেছি, তাহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদ (আঃ)-এর যামানা এবং ইহা অত্যন্ত বরকতপূর্ণ যুগ এবং ইহার মধ্যে ইসলামের প্রাধান্য নির্ধারিত আছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন, "আমি কেবল চতুর্দশ শতাব্দীর মোজদ্দেদ নহি, বরং আমি শেষ হাজার বৎসরের মোজাদ্দেদ।" অর্থাৎ আগামী এক হাজার বৎসর ব্যাপী আমার যামানা চলিবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমার মৃত্যুর পর কুদরতে সানীয়া অর্থাৎ নবুওতের তরীকায় খেলাফতের সেলসেলা জারি হইবে, যাহা কেয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তিত হইবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহ্মদীয়া জামাতে খেলাফতের প্রতিষ্ঠান কায়েম হইয়াছে এবং এই খেলাফত মোজাদ্দেদ সুলভ জরুরী উপাদান ও উপকরণ সহ ইনশাআল্লাহুল আযীয বিরতিহীন ধারায় কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকিবে। সেই জন্য অতঃপর এইরূপ মোজাদ্দেদের প্রয়োজন বাকী নাই, যিনি খেলাফতের উর্ধে হইবেন। এখন প্রত্যেক যামানায় হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর খলিফাগণের দ্বারা ধর্মের সংস্কার এবং ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়া যাইতে থাকিবে। সুতরাং, যে কেহ চিন্তা করিতেছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে খেলাফতে আহমদীয়া হইতে পৃথক এবং ইহার উর্ধে কোন মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হইবেন, সে ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছে এবং সে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মোকাম এবং পয়গামকে উপলব্ধি করে নাই।

দ্বিতীয় কথা –

যাহা এখন আমি আপনাদের স্মৃতি-ফলকে অঙ্কিত করিয়া দিতে চাই, উহা এই যে, কুরআন করীম এবং হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সকল বাতিল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট আছে। আকাশে ইহাও স্থিরীকৃত হইয়া আছে যে, তাঁহার মাধ্যমেই মানবমণ্ডলীকে এক উম্মত বানাইয়া ইসলামের পতাকাতলে একত্রিভূত করিয়া দেওয়া হইবে। ইসলামের এই বিশ্ব জোড়া প্রাধান্য এবং সকল জাতি ও ধর্মাবলম্বীর এক উম্মত হইয়া যাওয়ার জন্য এমন এক কেন্দ্রীয় ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য প্রয়োজন আছে, যিনি এই রুহানী নেযামকে সামগ্রিকভাবে পরিচালিত করিয়া যান এবং সারা দুনিয়ার জন্য সততা ও হেদায়েতের উপকরণ পরিবেশন করেন। একমাত্র খলিফাই এইরূপ ব্যক্তি হইতে পারেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর খেলাফতে-রাশেদা কায়েম হইয়াছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা বেশী দিন কায়েম থাকিতে পারে নাই।

এখন আল্লাহ্‌তায়ালা চৌদ্দ শত সাল পরে স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মহান আধ্যাত্মিক পুত্র হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে খেলাফতের সেলসেলা নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এক-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা আল্লাহ্‌তায়ালার এক বড় নেয়ামত। ইহার যথাযোগ্য মর্যাদা করা কর্তব্য। প্রত্যেক আহমদী পুরুষ ও স্ত্রীর কর্তব্য, আল্লার এই রজ্জুকে নিজেরাও মজবুতির সাথে ধরিয়া থাকিবে এবং স্ব স্ব ভবিষ্যৎ বংশধরগণকেও ইহার তাকিদ ও অসিয়ত করিয়া যাইতে থাকিবে।

তৃতীয় কথা—

এই যে বর্তমান যুগের জটিল সমস্যা সমূহের সমাধান, যেরূপ আমি পূর্বে বলিয়াছি, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে জ্ঞাত করাইয়াছেন এবং কুরআন করীমের নূতন তত্ত্বাবলী ও মর্ম তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। এই সমস্ত নূতন জ্ঞান এবং প্রকাশিত তথ্য সমূহ, যাহা প্রচ্ছন্ন কেতাবের ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর রচিত পুস্তক সমূহ এবং অমৃতবাণীর মধ্যে স্থানে স্থানে কোথাও বিস্তারিতভাবে এবং কোথাও বীজ আকারে বর্ণিত হইয়াছে। কুরআন করীমের জ্ঞানাবলী বুঝিবার এবং উহা হইতে সহি আলোক লাভ করিবার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় যে,

প্রথম দফায়—সদা কুরআন করীমের তর্জমা সহ তেলাওত করিতে হইবে এবং ইহার জন্য তফসীরে সগীর হইতে ফায়দা উঠাইতে হইবে।

দ্বিতীয় দফায়—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাবলী বার বার এবং গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। প্রত্যেক পরিবারের মেম্বারগণ প্রত্যেক তিন মাসকাল মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অন্ততঃ একখানি পুস্তক খরিদ করিবে এবং পড়িয়া শেষ করিবে। এইভাবে প্রত্যেক ঘরে যেন এই সকল পুস্তকের সম্পদ গড়িয়া উঠে এবং এগুলি সদা অধ্যয়নের মধ্যে থাকে।

তৃতীয় দফায়—প্রত্যেক আহামদী পরিবারে ইহার সুবন্দবস্ত হওয়া চাই যে, পরিবারের মধ্যে একজন ব্যক্তিও যেন উর্দু পড়া-লেখা না জানা না থাকে। এই প্রোগ্রামের উপর পুরা আমল হইতে থাকা চাই।

হে প্রিয় ভাই ভগ্নিগণ!

ইসলামের বিজয়ের দিন অতি নিকটে। ইহার জন্য যে কুরবানী এবং আত্ম-ত্যাগের প্রয়োজন, উহার যেন কোন ত্রুটি না হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বড় সহি কথা বলিয়াছেন যে, নৈকট্য লাভের ময়দান আপনাদের জন্য খালি পড়িয়া আছে। প্রত্যেক জাতি

দুনিয়ার সহিত প্রেম করিতেছে এবং খোদা যাহাতে সন্তুষ্ট, সেদিকে দুনিয়ার নজর নাই। তোমরা এতায়াত এবং বিশ্বস্ততার এমন নমুনা প্রদর্শন কর, যেন আকাশে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করে। তোমরা সেলসেলার মরকযের সহিত এরূপ এখলাস এবং আত্মবিলীনতার সম্বন্ধ রাখ যেন, শয়তান তোমাদের মধ্যে কোন ভাঙন ধরাইতে না পারে। স্মরণ রাখিও যে, এতায়াতের মৌখিক স্বীকৃতির কোন মূল্য নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমল উহার তসদীক করে। যদি তোমরা সম্পূর্ণভাবে খোদার দিকে ঝুঁক এবং আপন আপন উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থিবতার সংমিশ্রণ না রাখ, তাহা হইলে তোমরা খোদার এক মনোনীত জাতি হইয়া যাইবে এবং খোদা তোমাদের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন এবং তোমাদের জন্য বড় বড় আশ্চর্যজনক কার্য দেখাইবেন। খোদা করুন যেন তোমরা বর্ণিত কথাগুলি বুঝ এবং খোলা মনে এবং বিশ্বস্ততার সহিত উহাদের উপর আমল কর। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের সকলের হাফেয ও নাসের হউন, তোমাদের জান ও মালে বরকত দিন এবং তোমরা সদা তাঁহার নিরাপত্তা লাভে ধন্য হও। আমিন।

মীর্য নাসের আহমদ
খলিফাতুল মসীহ সালেস
তাং—১/২/৭৮ ইং

"মুজাদ্দিদ আখেরুয্ যামান" বা 'শেষ যুগের মুজাদ্দিদ' সম্পর্কে—

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)এর ইরশাদ :

"আদম (আঃ) হইতে জগতের নির্ধারিত আয়ুষ্কালের সপ্তম হাজার বৎসর হইল হেদায়েতের যুগ, যে যুগের মধ্যে আমরা মওজুদ রহিয়াছি। যেহেতু ইহা আখেরী হাজার বৎসরের যুগ, সেইহেতু ইহা জরুরী ছিল যে 'ইমাম আখের যামান' ইহার শিরোভাগে আসিতেন, এবং তাঁহার পর কোন ইমাম নাই, এবং না কোন মসীহ, কিন্তু সেই ব্যক্তি যিনি তাঁহার হইয়া তাঁহার প্রতিচ্ছায়া হিসাবে আগমন করেন। কেননা এই হাজার বৎসরে এখন দুনিয়ার আয়ুষ্কালের পরিসমাপ্তি ঘটিবে, এ সম্বন্ধে সকল নবী সাক্ষ্য দান করিয়াছেন। এবং এই ইমাম, যিনি খোদাতায়ালার তরফ হইতে মসীহ মওউদ বলিয়া আখ্যায়িত তিনি শতাব্দীরও মুজাদ্দিদ, এবং শেষ হাজার বৎসরকালেরও মুজাদ্দিদ। এ বিষয়ে খৃষ্টান ও ইহুদীগণেরও মতপার্থক্য নাই যে, আদম হইতে এই যুগ সপ্তম হাজারের যুগ।"

('লেকচার শিয়ালকোট পৃঃ ৭)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর এরশাদ :

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাযি আল্লাহু আনহু) এক প্রশ্নের জওয়াবে ৬ই এপ্রিল ১৯৪৭ইং তারিখে বলিয়াছেন :

"খলিফা স্বয়ং মুজাদ্দিদ হইতেও বড় হইয়া থাকেন এবং তাঁহার কাজ শরীয়তের আহকামকে বলবৎ ও কার্যকরী করা এবং দ্বীনকে কায়েম করা। সুতরাং তাঁহার বিদ্যমানতায় মুজাদ্দিদ কিরূপে আসিতে পারেন?"

"মুজাদ্দিদ তো সেই সময়ে আসিয়া থাকেন, যখন ধর্মে বিকারের সৃষ্টি হয়।"

('আল-ফজল ৮ই এপ্রিল, ১৯৪৭)

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি মুসলেহ মওউদ (রাঃ)

(২৯শে আগষ্ট ১৯৫৮ইং তারিখে প্রদত্ত)

সিনেমা এবং গানবাদ্য শয়তানের অস্ত্র যদ্বারা শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র গানবাদ্যের দরুণই ধ্বংস হইয়াছে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারাও যদি কোন জাতির মধ্যে চেতনা না আসে, তবে সেই জাতির পক্ষে জীবিত থাকার চেয়ে মরিয়া যাওয়াই মঙ্গল।

যে সকল যুবক-যুবতী সিনেমা দেখে, তাহারা যত শীঘ্রই জামাত হইতে পৃথক হইয়া যায়, আমাদের ততই মঙ্গল।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (রাজিঃ) সুরা নুরের ৩য় রুকুর আয়েৎ পাঠ করেন। অতঃপর বলেন, কোরআন করীমে আল্লাহতায়ালা মোমেনগণকে হেদায়েৎ স্বরূপ বলিয়াছেন, "হে মোমেনগণ তোমরা শয়তানের পদানুসরণ করিও না।" হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, 'গান বাদ্য ইত্যাদি শয়তানের অস্ত্র, যদ্বারা শয়তান মানুষকে পথ ভ্রষ্ট করিয়া থাকে। এই জন্যই আমি সিনেমা না দেখিবার জন্য জামাতকে হেদায়েৎ করিয়াছিলাম। কেননা, ইহাতে গান বাদ্য রহিয়াছে। পূর্বে থিয়েটারে ইহা ছিল। কিন্তু যখন হইতে টকি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাতেও গান বাদ্য প্রবেশ করিয়াছে। বরং ইহার প্রচলন আরও অধিক হইয়াছে। কেননা থিয়েটার মাত্র এক 'শো' হইত, এবং উহার বড় বড় অভিজ্ঞগণকে আনয়ন করা ব্যয় বহুল ছিল। তারপর এক 'শো' মাত্র এক স্থানেই প্রদর্শন করা যাইত। কিন্তু সিনেমা আবিষ্কৃত হইলে একটি 'শো' দ্বারা সহস্র সহস্র ফিল্ম প্রস্তুত করিয়া দেশময় প্রসারিত করা হয়, এবং প্রসিদ্ধ গায়ক গায়িকাকে ডাকা হয়। এই জন্য থিয়েটার হইতে সিনেমাতে অধিক অমঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।

কিছুদিন হইল মুলতান হইতে এক বন্ধু আমাকে পত্র লিখিয়াছেন যে আহমদী যুবকদের মধ্যে পুনরায় সিনেমা দেখার অভ্যাস বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা বন্ধ করা দরকার। আমার আশ্চার্য বোধ হইতেছে, এই যুবকগণ এত মূর্খ কেন হইল যে, ইতিহাস সম্বন্ধেও

তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। যদি তাহারা শিক্ষিত হইত এবং ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও থাকিত তবে জানিতে পারিত যে, বাগদাদও গান বাদ্যের দরুণই ধ্বংস হইয়াছিল।

হালাকু খান যখন বাগদাদ আক্রমণ করিয়াছিল। তখন বাদশাহর এই আওয়াজই শুনা যাইতেছিল যে, 'গায়িকাগণকে ডাক, গায়িকাগণকে ডাক। বাগদাদের উপর কেহই আক্রমণ করিতে পারিবে না। যদি কেহ আক্রমণ করে তবে সে নিজেই ধ্বংস হইবে।' অতঃপর তাঁহার দ্বারা যখন কিছুই হইলনা, তখন হালাকু খান জনৈক লোক দ্বারা বাদশাহকে ডাকিয়া পাঠাইল। বাগদাদের শেষ বাদশাহ মো'ছতাছমবিল্লাহ সংবাদ পাইয়া হালাকু খানের নিকট পৌঁছা মাত্রই তাহার আদেশে বাদশাহকে হত্যা করা হইল। অতঃপর তাঁহার শাহজাদাকে হত্যা করা হইল। অতঃপর বাগদাদের উপর আক্রমণ করিয়া হালাকু খান একদিনে আঠার লক্ষ মানুষ হত্যা করিল। ভবিষ্যতে যেন কেহ বাদশার স্থলাভিষিক্ত হইবার দাবী করিতে না পারে, সেই জন্য শাহী খান্দানের এক জনকেও জীবিত ছাড়িল না।

মোট কথা, আব্বাসিয়া খেলাফৎ ধ্বংস হইয়াছে গানবাদ্যের দরুণ। তদ্রূপ মোগল গণও ধ্বংস হইয়াছে গানবাদ্যের দরুণ। মোহাম্মদ শাহ রঙ্গিলাকে 'রঙ্গিলা' বলে কেন? এই জন্যই যে, তিনি গানবাদ্য প্রিয় ছিলেন। হিন্দুস্থানের শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ গানবাদ্যের দরুণ ধ্বংস হইয়াছেন। ইংরাজগণ কলিকাতা, কানপুর, এলাহাবাদ, মিরাঠ এবং সাহারণপুর হইতে অগ্রসর হইতেছিল এবং বাদশাহ দরবারে চলিতেছিল গান বাদ্যের আসর। বাদশাহ অতিরিক্ত ভাতার জন্য ইংরাজদের নিকট দরখস্ত করিয়াছিলেন। আর ইংরাজগণ তাঁহার বারজন পুত্রের মস্তক কাটিয়া খাঞ্চায় ভরিয়া বাদশাহর নিকট পাঠাইল যে, এই আপনার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভাতা। কাহারো একজন পুত্র মারা গেলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে মস্তকোপরি আকাশ উঠাইয়া লয়। আর বাদশাহের বার জন পুত্রের কাটা মস্তক পৌঁছিল বাদশার নিকট। স্পেন রাষ্ট্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে গান বাদ্যের দরুণ। সালাহুদ্দিন আইয়ুবী যখন মিশর আক্রমণ করেন, তখন ফাতেমী বাদশাহ মত্ত ছিলেন গান বাদ্যে। মোট কথা, মুসলমানগণের উপর যত বরবাদী আসিয়াছিল তার অধিকাংশই আসিয়াছিল গান বাদ্যের দরুণ।

খোদাতায়ালা মুসলমানগণকে সম্মানিত জাতি হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা পরিণত হইয়াছে বাদ্যকর জাতিতে। পরন্তু ইহাদের মধ্যে মোগল, পাঠান, সৈয়দ প্রভৃতি সম্মানিত জাতিও রহিয়াছে। যদি বাদ্যকর হইবারই সখ ছিল, তবে তোমাদের কর্তব্য ছিল বাদ্যকরের ঘরে জন্ম গ্রহণ করা। অন্যদিকে অবস্থা এই, কাহাকেও এই কথা বলিয়া দেখ যে অমুক বাদ্যকরের মেয়েকে বিবাহ কর। তবে এই বলিয়া ঝগড়া আরম্ভ করিবে যে, আমি কি বাদ্যকর নাকি? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত লোকই বাজারে চলা ফেরা করিবার সময় ঐ রাগিনীই গায়, যাহা বাদ্যকরগণ গাহিয়া থাকে। মোট কথা, তাহারা নিজে বাদ্যকর হইতে, সন্তানকে বাদ্যকর করিতে ও স্ত্রীকে বাদ্যকারিনী করিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ মনে করেনা। অথচ যদি বলা হয় যে, অমুক বাদ্যকরের সহিত কুটুম্বিতা কর, তবে ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দেয়।

আল্লাহ্‌তালা এই সম্বন্ধে মুসলমানগণকে খুব বড় শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমানগণ ইহা দ্বারা কোন প্রকার নছিহত লাভ করে নাই। দিল্লি, মিশর, স্পেন এবং বাগদাদের বরবাদী ইহা দ্বারা হইয়াছে। কোথায় সমগ্র স্পেন মুসলমানগনের দখলে ছিল, আর আজ মাত্র একটি মসজিদ, যাহা বাকী রহিয়াছে। ইহারও অবসান ঘটাইবার জন্য খৃষ্টানগণ উদগ্রীব। মোট কথা, মুসলমানদের উপর অপরিসীম অত্যাচার হইয়াছে। কিন্তু এখনও তাহাদের আকাঙ্খা এই যে, সিনেমা দেখি এবং গান বাদ্য শ্রবণ করি। তাহারা এক অন্যকে এই বলিয়া সিনেমার প্রতি আকৃষ্ট করে যে, খুব ভাল ফিল্ম আসিয়াছে। অর্থাৎ খুব ভাল বাদ্যকর আসিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানগণ বরাবর ভোগ বিলাসের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কেও খোদাতায়ালা এই বিষয়ে ভয় প্রদর্শন পূর্বক বলিয়াছেন, "তোমার উপরও ঐরূপ জমানা আসিবে, যেরূপ হযরত মুসা (আঃ -এর উপর আসিয়াছিল।" ("তাজকেরাহ্ ৪৬২ পৃঃ) সাধারণতঃ ইহার এই অর্থ করা হয় যে হযরত মুসা (আঃ)-এর ওম্মত যেরূপ ফেরাউনের অত্যাচারের মোকাবেলা করিয়াছিল, তদ্রূপ জামাতে আহমদীয়ার উপরও পরীক্ষা দেখা দিবে। কিন্তু এই ইলহামের অন্য দিক হইল, ইহুদী নারী-পুরুষ গান-বাদ্যে খুবই প্রসিদ্ধ। অতএব এই ইলহাম দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তোমার জামাতের উপরও ঐরূপ জামানা আসিবে। অর্থাৎ তাহারা প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া গান বাদ্যের প্রতি মনোযোগ দিবে।

আমি তো মনে করি, ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারাও যদি কোন জাতির মধ্যে চেতনা না আসে, এবং যে কার্যের দরুণ পূর্ববর্ত্তীগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে ঐ কার্যই করিতে থাকে, তবে তাহাদের জীবিত থাকার চেয়ে মরিয়া যাওয়াই ভাল। আমার মতে মুলতানের পত্র লেখককে আমার নিকট লিখিবার দরকার ছিলনা। তাহার উচিত ছিল মসজিদে সমস্ত জামাতের সামনে ঐ যুবককে দাঁড় করাইয়া এই কথা বলা যে, "তুমি বল, আমি আমার এই কার্যদ্বারা সমস্ত জামাতকে ধ্বংস করিয়া ফেলিব। আমি আহমদীয়াতকে মিটাইয়া ফেলিব। কেননা যে কার্য আমি করিতেছি এই কার্য দ্বারা আমি মিটিয়া যাইব এবং জামাতও মিটিয়া যাইবে।" আমার মনে হয়, কোন খবিছ হইতে খবিছ মোনাফেক ও ইহা বলিতে সাহস করিবেনা। মাত্র ইহাই হইতে পারে যে, জামাত হইতে পৃথক হওয়ার ঘোষণা করিতে পারে। এইরূপ ব্যক্তি যত শীঘ্র পৃথক হয় ততই মঙ্গল। ইহাদের পৃথক হওয়াতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবেনা! বরং উন্নতিই হইবে। হযরত ওসমান (রাজিঃ) এই ভুলের মধ্যেই পতিত ছিলেন যে, 'আমি নিজে কিরূপে মুসলমানগণকে শাস্তি দিতে পারি?' বরং প্রশ্ন হইল, কোন মুসলমান যখন অন্য মুসলমানকে হত্যা করিতে উদ্যত হয় তখন তাঁহার জন্য কিরূপে সম্ভব ছিল যে, এমন লোককে শাস্তি দিতে তাঁহার কুণ্ঠা বোধ হয়? আমি তো মনে করি যদি হযরত ওসমানের (রাজিঃ) সময় মারোয়ান এবং আব্দুল্লাহ বিন সাবাকে হত্যা করা হইত, তবে সমস্ত ঝগড়া মিটিয়া যাইত। সাধারণতঃ মারোয়ান দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলনা। কিন্তু তাহার দরুণ যখন মুসলমানগণ নিহত হইতে ছিল তখন তাহার শিরোচ্ছেদ করাতে দোষের কি ছিল? তদ্রূপ আব্দুল্লাহ বিন সাবা সমস্ত কুফা, বসরা এবং মিশরে

ঝগড়া বাঁধাইতে ছিল। কিন্তু তাহার গর্দ্দান উড়ানো হইলনা। পরিশেষে গর্দ্দান উড়ানো গেল হযরত ওসমান (রাজিঃ)-এর, যিনি আল্লাহ্‌র খলিফা ছিলেন। মারোয়ান এবং আব্দুল্লাহ বিন সাবার গর্দ্দান যদি উড়ানো হইত তবে হযরত আলী (রাজিঃ)এর ঘটনাও ঘটিত না, হযরত ইমাম হোসেন (রাজিঃ)ও শহীদ হইতেন না।

সুতরাং এই প্রকার লোক পৃথক হইয়া গেলে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। পূর্ববর্ত্তীগণ এই জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন যে, তাঁহারা ফসাদ সৃষ্টি হইবার ভয়ে অপরাধীকে শাস্তি দেন নাই। প্রকৃতপক্ষে অপরাধীকে শাস্তি দিলে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়না। বরং ফসাদ মিটাইবার জন্য ইহা একটি অস্ত্র। অতএব, আমাদের জামাতের কর্ত্তব্য এমতাবস্থায় একত্ব সূত্রে আবদ্ধ হওয়া, এবং ফসাদ ছড়াইতে না দেওয়া প্রকৃতপক্ষে জামাতের সবকিছুই নির্ভর করে জামাতের একতার উপর একজন কিছুই করিতে পারে না। যদি হযরত ওসমান (রাজিঃ) এর সময় সমস্ত মদিনাবাসী একতাবদ্ধ হইতেন, তবে হযরত ওসমান (রাজিঃ)-এর উপর আক্রমণ করিবার কাহারও সাহস হইত না। সাহস এই জন্যই হইয়াছিল যে তাহারা দেখিল যে তিনি একা। তাঁহার সহায়তাকারী কেহই নাই। মানুষ এই তর্ক তো করে যে হযরত ওসমান (রাজিঃ)-র অপরাধ কি ছিল যে তাঁহার সময় ফসাদ হইয়াছিল, এই তর্ক কেহই করে না যে মিশরের মুসলমানগণের কি অপরাধ ছিল, কুফা, বসরা ও মদিনার মুসলমানগণের কি অপরাধ ছিল? কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন, যে সম্বন্ধে তর্কের প্রয়োজন, তাহা এই যে, যদি সমস্ত মুসলমান একত্রিভূত হইয়া ফেৎনা সম্প্রসারণকারীদের মোকাবেলা করিতেন, তবে মারোয়ান বা ইবনে সাবার কি সাধ্য ছিল যে ফেৎনা প্রসার লাভ করে? এই ঝগড়ার প্রকৃত সমাধান ইহাই যে সমস্ত মুসলমানই অপরাধী। যদি তাহারা একতাবদ্ধ হইতেন, তবে ফেৎনা প্রসারিত করিবার সাহস কাহারো হইত না।

দেখ, হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আওয়াল (রাজি)-র ওফাতের সময় মৌঃ মোহাম্মদ আলী সাহেব মস্ত বড় ঝগড়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জামাতে তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু আমাদের জামাত তাহার মোকাবেলায় এমন একতাবদ্ধ হইলেন যে তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। আল্লাহতায়ালা আমাদের জামাতকে প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার তৌফিক দিন। আমিন।

অনুবাদ : আহসান উল্লাহ সিকদার

বাহাই ফেৎনা

—আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী

মহানবী (সাঃ) তাঁর ধর্মের বিরুদ্ধে ত্রিশ দাজ্জালের উদ্ভব হবে বলে ভবিষ্যদ্বানী করে গিয়েছিলেন (তিরমিজি ইত্যাদী)। ঐসব দাজ্জালের মধ্যে এক দাজ্জাল খোরাশান থেকে নির্গত হবে বলে উল্লেখ করেছিলেন (মেশকাত)। এই দাজ্জাল শামদেশ এবং ইরাকের মধ্যে দিয়ে গমন করে ফেৎনা সৃষ্টি করবে (মেশকাত)। এই দাজ্জালের কার্যকাল চল্লিশ বৎসর বলে উল্লেখ করা হয়েছে (ঐ)। মহানবী (সাঃ) এক কাশ্‌ফে এই দাজ্জালকে কাবার চারিদিকে চক্কর দিতে দেখেছিলেন এবং এর তাবির (অর্থ) করে বলেছিলেন যে, এই দাজ্জাল ইসলাম ধর্মের মধ্যে বক্রতা অনুসন্ধান করবে এবং এর দ্বারা ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবে (মজমায়ুল বেহার, জি—৩)। তিনি এও বলেছেন যে, আল্লাতায়ালা এই দাজ্জাল দ্বারা ইসলামের কেন্দ্রকে আক্রান্ত হতে দেবেন না। সে শাম দেশের দিকে ফিরবে এবং সেখানে অক্কা-প্রাপ্ত হবে (মেশকাত)। উক্ত দাজ্জালের এক আলামত বর্ণনা করতে যেয়ে মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন যে, এই দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী ইসপাহান তথা ইরানের অধিবাসী হবে (ঐ)। সে নিজেকে নবী-রসুল না বলে খোদারূপে প্রকাশ করবে (ঐ)। এক বর্ণনায় দাজ্জালকে যুবক এবং অন্য বর্ণনায় বৃদ্ধ বলা হয়েছে (হুজাজুল কেরামা)। দাজ্জালের দলে স্ত্রীলোকও থাকবে। (কানজুল উম্মাল)। দাজ্জাল মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে লোককে বিভ্রান্ত করবে (মেশকাত)। সর্বাবস্থায় দাজ্জালদেরকে চিনবার জন্য মহানবী (সাঃ) সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করে দেখতে বলে গিয়েছিলেন (মুসলেম ইত্যাদি)।

সুরা কহাফের প্রথম দশ আয়াতে একদিকে যেমন খৃষ্টানদের মিথ্যা আকিদার কথা বলা হয়েছে, তেমনি কোরআনের শিক্ষায় যে কোন প্রকারের বক্রতা নেই সেকথাও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, দাজ্জাল কোরআনের আয়াত সমুহের কদর্থ করে তাতে বক্রতা সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চালাবে। উদ্ধৃত হাদিছের মধ্যেও উল্লেখ করা হয়েছে যে দাজ্জাল ইসলামের শিক্ষার মধ্যে বক্রতা অনুসন্ধান করবে।

প্রায় দেড় শতাব্দী হতে চলল খোরাশানের রাজধানী বাদিস্ত শহরে বাব সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক—যার মধ্যে উম্মে সালমা নাম্নী এক মহিলাও ছিল, একত্রিত হয়ে ইসলামী শরিয়তকে মনছুখ (বাতিল) ঘোষণা করে এবং আলী মোহাম্মদ নামক এক যুবককে নব ধর্ম প্রবর্তক বলে ঘোষণা করে। এরা কোরআনের আয়াতের বক্র এবং বিকৃত অর্থ করে

প্রচার করতে থাকে যে, ইসলামী শরিয়ত মাত্র এক হাজার বৎসরের জন্য কার্যকর ছিল। বর্তমানে এর কার্যকাল পূর্ণ হওয়ায় নব ধর্মের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এরা শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামদের বর্ণিত বলে কথিত কতিপয় বাক্যকে হাদীস আখ্যা দিয়ে তাদের নবধর্মের এবং ধর্ম প্রবর্তকের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করে। ইরানের বিশেষ করে ইস্পাহানের বেশ কতিপয় লোক এই নবধর্মের অনুসারী হয়ে তা প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। আলী মোহাম্মদ প্রথমে শেয়খিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী বাব হওয়ার দাবী করেন, পরে তা উন্নীত হয়ে কায়েম বা মাহদী হওয়ার দাবীতে পরিণত হয়। তার নবধর্ম প্রতিষ্ঠার সাত বৎসর পূর্ণ হতে না হতেই তিনি মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে নিহত হন। বাবীরা ইরান থেকে বিতাড়িত হয়ে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে ১৮৬৩ সালে আলী মোহাম্মদের অন্যতম শিষ্য হোসেন আলী তার গুরুর ধর্ম বিধানকে বাতিল করে আর একটি ধর্মমতের জন্ম দেন। এই ধর্মের নাম দেওয়া হয় বাহাই ধর্ম। বাবীদের একদল হোসেন আলীর ধর্মকে গ্রহণ না করে এর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেফে লে ফেৎনা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। স্থানীয় সরকার এদের কার্যকলাপে অতিষ্ট হয়ে বাহাইদেরকে তৎকালীন শামদেশের হাইফা এলাকায় নির্বাসন দেয়। বাহাই ধর্ম প্রবর্তক দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল নির্বাসিত ও কারারুদ্ধ জীবন যাপন করে বৃদ্ধ বয়সে ঐ এলাকাতেই মৃত্যুবরণ করেন। হোসেন আলী বাহাউল্লা নিজেকে কখনও নবী বা রসুলরূপে প্রকাশ করেন নি। বাহাইরা তাকে 'মুস্তাকীল খোদায়ী মজহর' বলে মনে করে। বাহাউল্লার লিখিত পুস্তককে ঐশী বাণী এবং তা বাহাউল্লা কর্তৃক অবতীর্ণ বলে বিশ্বাস করে। দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে এই মতবাদ কিছু কিছু প্রসার লাভ করলেও ইসলামের কেন্দ্রগুলি এই ফেৎনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই ফেৎনা সম্বন্ধে মহানবী (সাঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করেছে।

খৃষ্টানগণ ঈসা (আঃ)-কে খোদার পুত্র বানিয়েছে আর বাহাই ধর্মাবলম্বীরা বাহাউল্লাকে বানিয়েছে স্বয়ং খোদা (মায়াজাল্লা)। আর এ জন্য বাহাইদের দাবী হল, খৃষ্টধর্ম এবং বাহাই ধর্ম মূলতঃ একই প্রকার (বাহাউল্লা আওর আছরে জদীদ, ৩য় সংস্করণ)। অতএব খৃষ্টিয় ফেৎনা এবং বাহাই ফেৎনা যে আসলে একই দাজ্জালী ফেৎনা তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই দাজ্জালী ফেৎনার বিনাশকল্পে আল্লাহতায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে যথাসময়ে প্রেরণ করেছেন। তাই কোন আহমদীর সঙ্গে দলীল-প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করতে বাহাইরা কখনও রাজী হয় না। এসম্বন্ধে বাহাইরাই বলুন, আলোচনা করতে রাজী আছেন কি ?

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর—২৩)

খৃষ্টধর্মের অপ-প্রচারের মোকাবিলা

সর্বপ্রথম দেখা যায়, হযরত মীর্যা সাহেব কিভাবে খৃষ্টধর্মের অপ-প্রচারের মোকাবেলা করেছেন। প্রচলিত খৃষ্টধর্মের কেন্দ্রীয় মূল বিশ্বাস হলো এই যে, যীশুখৃষ্ট ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেছেন, তাঁর মৃত্যু হয়ে ছিল তাঁর উপর বিশ্বাস-স্থাপনকারীদের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এবং মৃতাবস্থা থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর যীশু এখন স্বর্গে খোদার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করছেন। অর্থাৎ যীশু 'অন্যদের জন্য মৃত্যুবরণ' করেছেন এবং তৎপর স্বর্গারোহণ করেছেন—এই হলো প্রচলিত খৃষ্টধর্মের মূল-কথা। 'যীশু খোদা ছিলেন'—এ ছাড়া এইরূপ বিশ্বাসের আর কি অর্থ হতে পারে? হযরত মীর্যা সাহেব এ সকল বিশ্বাসের স্বরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন। তিনি বাইবেলের নূতন নিয়মের আলোকেই যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু, তাঁর অলৌকিক পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখালেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে, বাইবেলের নূতন নিয়ম যে পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছে তার দ্বারাও সুস্পষ্টাকারে প্রমাণিত হয় যে, যীশু ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেন নাই। কারণ এটা জানা ছিল যে, কোন ব্যক্তি তিন দিন ক্রুশবিদ্ধ থাকার পরও মরে নাও যেতে পারে। পক্ষান্তরে যীশুর মাত্র তিন চার ঘণ্টা ক্রুশে ছিলেন। তাছাড়া বর্শার দ্বারা আঘাতের ফলে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর পার্শ্বদেশ হতে গরম রক্ত নির্গত হয়েছিল বলে বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে (জন ১৯ : ৩১—৩৪)। কোন মৃতদেহ থেকে এমন ভাবে গরম রক্ত নির্গত হতে পারে না।

যীশু স্বয়ং তাঁর জীবনাবসান সম্পর্কে রূপক ভাষার আলোকে বর্ণনা করে বলেছেন : "An evil and adultrous generation seeketh for a sign ; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas : for as Jonas was three days and three nights in the whale's belly, so shall the son of man be three days and three nights in the heart of the earth." (Mathew 12 : 35—40).

প্রোফেট যোনা অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আঃ) জীবন্ত অবস্থায় তিমি মাছের দ্বারা ভক্ষিত হয়ে পুনরায় জীবন্ত অবস্থায় তিমির পেট থেকে নির্গত হয়েছিলেন যীশুর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তিনিও জীবন্ত অবস্থায় তিন দিন তিন রাত্রি কোন কবরের অভ্যন্তরে থাকবেন এবং সেখান থেকে জীবন্ত অবস্থায় বের হয়ে আসবেন। খৃষ্টানগণ হযরত মীর্যা সাহেবের এই যুক্তি খণ্ডন করতে পারলেন না। ক্রুশে যীশুর মৃত্যু বরণ এবং তার ফলে "অন্যদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত লাভ"—প্রচলিত খৃষ্টধর্মের এই তত্ত্ব হযরত মীর্যা সাহেবের যুক্তির আলোকে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এইভাবে খ্রীষ্টধর্মের এক পদ তথা অবলম্বন হারালো। অন্য একটি পদ অর্থাৎ যীশুর পুনরুত্থান, যীশুর স্বর্গারোহণ, ইত্যাদি বিষয়ও তিনি বাইবেল থেকেই প্রমাণ করে দেখালেন যে, এগুলো অসার গল্প ছাড়া কিছুই নয়। বাইবেলের নূতন নিয়ম (New Testament) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই তিনি প্রমাণ করলেন যে, যীশু স্বর্গারোহণ করেন নাই, বরং তিনি ইসরাইল জাতির "হারা না মেষের' (অর্থাৎ হারানো অংশের) সন্ধানে পূর্বাদেশে যাত্রা করেছিলেন যীশু "হারানো মেষ" সম্বন্ধে তাঁর দায়িত্বের কথা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন :

.....the other sheep I have which are not of this fold : them also must I bring." (John 10 : 16).

ইসরাইলের ১২টি বংশের মধ্যে ১০টি বংশই বন্দী অবস্থায় পূর্বাঞ্চল আফগানিস্তান ও পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে নির্বাসিত হয়েছিল। তাদের খোঁজ-খবর করা এবং তাঁর বাণী তাদের নিকট পৌঁছানো যীশুর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল। তা না হ'লে যীশুর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো।

হযরত মীর্যা সাহেব তাঁর এই তত্ত্ব প্রমাণ করলেন প্রাচীন ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক তথ্যাদিপূর্ণ যুক্তির মাধ্যমে। যীশুর অনুসারীগণ ভারতবর্ষ সফর করেছিল তা পূর্ব হতেই সুবিদিত বিষয় ছিল। তিব্বতে এমন একটি পুস্তক পাওয়া গিয়েছে যা বাইবেলের (নূতন নিয়ম) প্রায় অনুরূপ। সুতরাং যীশু এই সকল অঞ্চলে নিশ্চয়ই আগমন করে থাকবেন। আফগানিস্তান এবং কাশ্মীরের বিভিন্ন শহরের নাম, গ্রামের নাম, নদীর নাম এবং বিভিন্ন বংশের নামকরণ হতে বুঝা যায় যে, এই অঞ্চলগুলিতে এক সময় ইহুদীরা বসবাস করতো। 'কাশ্মীর' নামটিও একথার প্রমাণ। 'কাশ্মীর' শব্দটি 'কাশির' শব্দ হতে উদ্ভূত। কাশ্মীরের আদি অধিবাসীদের নিকট এই স্থান 'কাশীর' বলেই পরিচিত ছিল (পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জি, এম, ডি, সুফী লিখিত কাশ্মীরের ইতিহাস সংক্রান্ত দুই খণ্ড বিশিষ্ট পুস্তকে

এই স্থানকে 'কাশীর' বলা হয়েছে)। কাশীর কথাটি মূলতঃ 'কা—শীর' অর্থাৎ 'শীর' বা শিরিয়া দেশের মত—অর্থাৎ কাশ্মীর এমন একটি দেশ যা 'সিরিয়ার মত' এবং সিরিয়া হলো ইসরাইল জাতির আদি ভূমি।

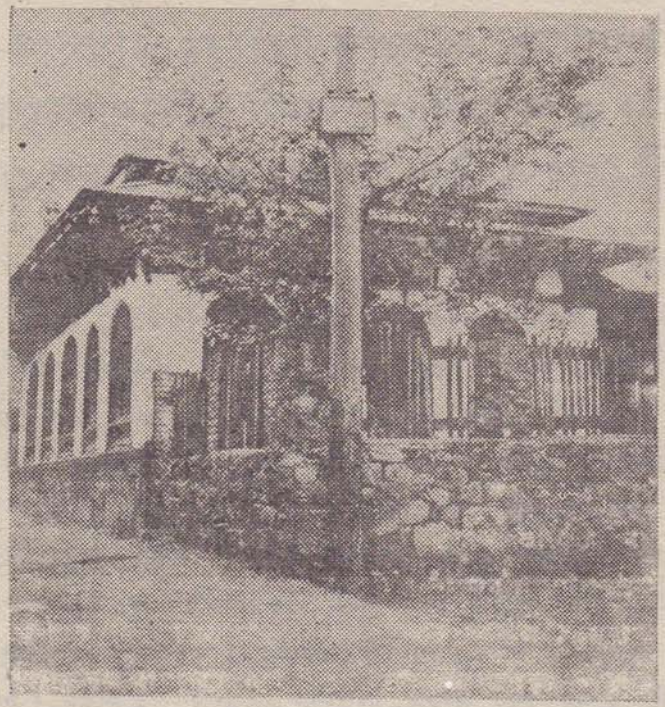

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সমাধি
খান ইয়ার ষ্ট্রীট, শ্রীনগর কাশ্মীর।

হযরত মীর্যা সাহেব কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগরের খান ইয়ার নামক মহল্লায় যীশুর কবর আবিষ্কার করে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত তাঁর নব-আবিষ্কৃত তত্ত্বের চরম প্রমাণ পেশ করেন। শ্রীনগরের খানাইয়ার মহল্লায় উক্ত সমাধি বহুকাল ধরে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সেই 'শাহজাদা-নবীর কবর' বলে পরিচিত হয়ে আসছে, যিনি পশ্চিমাঞ্চল হতে প্রায় ১৯০০ বছর আগে এই অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। এই সমাধিটি 'ঈসা সাহেবের কবর' বলেও অভিহিত হয়েছে। বস্তুতঃ পবিত্র কুরআনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ীই এইরূপ হয়েছে: "ওয়া জায়ালনাবনা মারইয়ামা ওয়া উম্মাহু আইয়াতাঁও ওয়া আ-ওয়াইনাহুমা ইলা রাবওয়াতেন যাতে ফরারেঁ ও ওয়া মায়ীন" অর্থাৎ—"এবং আমরা মরিয়ম পুত্র এবং তাঁহার মাতাকে নিদর্শন স্বরূপ করেছিলাম এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম উচ্চ স্থানে এবং স্রোতশীলা ঝর্ণা প্লাবিত উপত্যকায়।" (সুরা মুমেনুন: ৫১)।

এইভাবে যীশুর ঈশ্বরত্বের উপর বিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়—মৃত যীশু আর কখনও পৃথিবীতে আসবেন না।

('দাওয়াত-উল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার—
পঞ্চান্নতম সালানা জলসা উদযাপিত

ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয়ের রাজপথে—
এতায়াত ও আত্মত্যাগের একটি অবিচল পদক্ষেপ—
ঐশী-প্রেম ও ঐকান্তিকতার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ

ঢাকা ঃ ৫ই মার্চ ১৯৭৮ ইং

আজ রোববার বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তিনদিন ব্যাপী পঞ্চান্নতম বার্ষিক সম্মেলন আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজার তিনেক মুমিন-মোমেনা এই মহতী সম্মেলনে যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দুই সহস্রাধিক ব্যক্তিও জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করেন। কোরআন করীম তেলাওত এবং কোরআন করীমের উপরে রচিত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একটি নযম পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় প্রথম অধিবেশন শুক্রবার বাদ নামায জুম'আ। হযরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পবিত্র পয়গাম পেশ ও সেইসঙ্গে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মহতারম মৌলবী মোহাম্মদ (সাল্লামাহু), আমীর বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়া। হযরত আমীরুল মুমেনীন (আইঃ) তাঁর পয়গামে সম্মেলনের কামিয়াবীর জন্য দোওয়া করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ পয়গামে হুজুর (আইঃ) বলেন—

"হযরত মসিহ মওউদ (আইঃ) বলিয়াছেন, 'আমি কেবল চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ নহি। বরং আমি শেষ হাজার বৎসর কালেরও মোজাদ্দেদ।' ..... 'আমার এন্তেকালের পর কুদরতে সানিয়া অর্থাৎ নবুওতের তরীকায় খেলাফতের সেলসেলা জারি হইবে, যাহা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকিবে।' "সুতরাং যে কেহ চিন্তা করিতেছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে খেলাফতে আহমদীয়া হইতে পৃথক এবং ইহার উর্ধে কোনো মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হইবেন সে ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছে এবং সে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর মোকাম এবং পয়গামকে উপলব্ধি করে নাই।" হুজুর (আইঃ) আরও বলেন—"ইসলামের বিশ্ব-জোড়া প্রাধান্য এবং সকল জাতি ও ধর্মালম্বীর এক-উম্মত হইয়া যাওয়ার জন্য এমন কেন্দ্রীয় ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য প্রয়োজন, যিনি এই আধ্যাত্মিক সংগঠনকে সামগ্রিকভাবে পরিচালিত করিয়া যান এবং সারা দুনিয়ার জন্য সততা ও হেদায়েতের উপকরণ সমূহ পরিবেশন করিতে থাকেন। একমাত্র খলিফাই এইরূপ ব্যক্তি হইতে পারেন"

অতঃপর, কোরআন করীম তর্জমা ও তফসীরসহ পাঠ করা, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী পাঠ করা ও উর্দু শেখার জন্য নির্দেশ দান করে হুজুর (আইঃ) বলেন : "এবাদাত বা আনুগত্যের মৌখিক স্বীকৃতির মূল্য নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমল উহার তসদীক করে। তোমরা সম্পূর্ণভাবে খোদার দিকে ঝুকিয়া পড় এবং আপন আপন উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে বিন্দুমাত্র দুনিয়াদারীর সংমিশ্রণ না রাখ। তাহা হইলে তোমরা খোদার এক মনোনীত জাতি হইয়া যাইবে এবং খোদা তোমাদের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন এবং তোমাদের জন্য বড় বড় আশ্চর্যজনক কার্য দেখাইবেন।"

তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে পাঁচটি অধিবেশন হয়। পূর্বনির্ধারিত ও আহমদীর বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী আল্লাহতায়ালার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে প্রতিটি অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। রোববার সকালের অধিবেশনে পূর্ব নির্ধারিত দুইজন বক্তার অসুবিধার জন্য তাঁদের পরিবর্তে বক্তৃতা করেন জনাব বি, এ, এম, সাত্তার সাহেব এবং জনাব এস, এ, নিজামী সাহেব (চিটাগাং)। তাছাড়া দুইটি সন্ধ্যাকালীন তরবিয়তী অধিবেশন, খোদ্দাম ও আনসার অধিবেশন এবং মহিলাদের লাজনা অধিবেশন সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। লাজনা অধিবেশন উদ্বোধন করেন মোহতারম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

জলসার সমাপ্তি ভাষণে হযরত আমীর সাহেব (সাল্লামাহু) বলেন যে, আজ দুনিয়ার বস্তুবাদী দর্শনের চতুর্মুখী আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়েছে ইসলাম, ইসলামের কেতাব ও ইসলামের নবী (সাঃ আঃ)। তিনি বলেন যে, এই সকল আঘাত প্রতিহত করবার যোগ্যতা ৭২ ফেরকায় বিভক্ত মুসলমানদের নেই—আছে শুধু আহমদী মুসলমানদের। হযরত খাতামান্নবীঈন মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে তরবারীর দ্বারা জয়লাভের যে ঘৃণ্য অপবাদ, তার খণ্ডন করে তিনি বর্তমান যামানায় জামাতে অহমদীয়ার ইসলাম প্রচারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে দলীল-প্রমাণ, আদর্শ ও নিদর্শনের মাধ্যমে আহমদীরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত। বিদ্রোহ-বাগাওৎ বা অকল্যাণকর কোনো কাজের জন্য কোথাও কোনো আহমদীকে আজও পর্যন্ত কেউ দায়ী করতে পারেনি। তারা স্ব স্ব দেশে অনুগত নাগরিক। আজ দুনিয়ায় দেশে দেশে হযরত রসুল করীমের (সাঃ) প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার ও তাঁর শান্তির পতাকা উড্ডীন করার পবিত্র দায়িত্ব পালন করে চলেছে তাঁর উম্মতের যে দল তারই নাম জামাতে আহমদীয়া।

অতঃপর সম্মিলিত দোওয়ার মধ্যমে এই বরকতমণ্ডিত পবিত্র রূহানী জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অন্যান্যবারের মত এবারেও জলসায় জামাতের তবলীগী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। উল্লেখ্য যে, এবারে জলসা শেষে তের জন ভ্রাতা-ভগ্নি আহমদীয়া জামাতের বয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়া, কয়েকটি বিবাহের ঘোষণা করা হয় এবারের জলসায়।

সংবাদ :

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কায়েদের তরবীয়তি সফর

"গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার হইতে ২১শে ফেব্রুয়ারী রোজ মঙ্গলবার পর্যন্ত চট্টগ্রামের বিভাগীয় কায়েদ জনাব এস, এ, নিজামী সাহেব চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন মজলিশ সমূহ পরিদর্শন করেন। এই সফরে তাঁর সহিত ছিলেন সর্বজনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার, কায়েদ, চট্টগ্রাম, নজীর আহমদ, জিলা কায়েদ, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী এবং শহীদুল ইসলাম, বিভাগীয় মোতামদ।

তিনি ১৮ তারিখে বি-বাড়িয়া মসজিদে-মোবারকে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সমাবেশে খোদ্দামের উদ্দেশ্যে তরবীয়তী বক্তৃতা করেন। ১৯ তারিখে সিলেটের জামাল পর ও বি-বাড়িয়া অঞ্চলে খাটুরা মজলিস পরিদর্শন করেন এ সকল মজলিস তথা জামাত সমূহে এক প্রাণের সঞ্চার হয় ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি ক্রোড়া মজলিস পরিদর্শন করেন এবং তথায় সমগ্র জমাতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উদ্দেশ্যে তরবীয়ত ভাষণ দান করেন। সেই দিনই তিনি তারুয়া সালানা জলসায় যোগদান করেন এবং জলসার সমাপ্ত অধিবেশনে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে এক জোরালো ভাষণ দান করেন।

দিবাশেষে তিনি এতদাঞ্চলের সমস্ত খোদ্দামের এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন, এবং তরবীয়তী বক্তৃতা দেন। পরদিন ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথমে সকাল ৭ ঘটিকায় এতদাঞ্চলের সমস্ত মজলিসের খোদ্দামের সমাবেশে বি-বাড়িয়া-মসজিদে মোবারকে বক্তৃতা করেন, এবং পরদিন দুপুর দু'টার কুমিল্লার নন্দনপুর মজলিস পরিদর্শন করেন এবং তথায় খোদ্দামের সমাবেশে বক্তৃতা করেন। এরপর তিনি নন্দনপুর প্রথম আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং সর্বশেষে উক্ত মজলিসে 'মোসলেহ মাওউদ' দিবসের সভায় সভাপতিত্ব করেন। সেই দিনই তিনি গ্রীনএরো যোগে চট্টগ্রাম ফিরিয়া আসেন। (সংবাদদাতা)

জামালপুরে নতুন মজলিস কায়েম

বিগত ৫/২/৭৮ রবিবার, ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিস কায়েম করা হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব সলিমউল্লাহ্ সাহেবের বাসায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ থেকে আগত জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী (জেলা কায়েদ ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল), ময়মনসিংহ মজলিসের কায়েদ জনাব মোঃ সাদেক ও মোতামদ জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন এবং নও-আহমদী ভ্রাতা জনাব হযরত আলী। নবগঠিত মজলিসের কর্মকর্তাবৃন্দ হলেন :—

* কায়েদ—জনাব দস্তুর উল্লাহ্
* মোতামদ ও নাজেমে আতফাল – জনাব অব্দুল গফুর চৌধুরী
* নাজেমে মাল—জনাব রেজাউল্লাহ্।

(সংবাদদাতা)

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar